মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার কেন এই অধঃপতন

প্রভাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার কেন এই অধঃপতন — প্রভাস ঘোষ
(৫ আগস্ট, ২০১৬-এর ভাষণ)

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

প্রকাশক ঃ মানিক মুখার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

প্রকাশকের কথা

৫ আগস্ট, ২০১৬। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে কলকাতার রানি রাসমনি অ্যাভেনিউয়ে এক বিরাট সমাবেশ হয়। টানা বর্ষার মধ্যে ঐ সভায় প্রধান বক্তা দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বক্তব্য রাখেন। বৃষ্টির মধ্যেই হাজার হাজার মানুষ শান্তভাবে তা শোনেন। ঐ বক্তৃতা ইতিপূর্বে দলের বাংলা মুখপত্র গণদাবীতে প্রকাশিত হয়। এখন তা বই আকারে প্রকাশ করা হল।

২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ **মানিক মুখার্জী**
কলকাতা

মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার কেন এই অধঃপতন

আমরা যাঁরা মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছি, আজকের দিনটিতে এই প্রশ্ন তাঁদের বিবেকের কাছে বারবার আসে — আমরা যতটুকু তাঁর কাছ থেকে শিখেছি, তার কতটুকু বাস্তবে প্রয়োগ করতে পেরেছি। আমাদের বিপ্লবী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য নিজেকে তিলতিল ক্ষয় করে মাত্র ৫৩ বছর বয়সে এই মহান নেতা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। প্রশ্ন জাগে, আমরা কতটুকু আমাদের জীবনসংগ্রামে, এ দেশের জনগণের মুক্তি আন্দোলনে সেই শিক্ষাকে কার্যকর করার জন্য ভূমিকা পালন করছি? এটাও অনেকের কাছে বিস্ময়কর, যাঁর নাম ও শিক্ষা কোনও দিন সংবাদমাধ্যম প্রচার করেনি, প্রচলিত অর্থে শক্তি বলতে যা বোঝায় সেই সরকার-এমপি-এমএলএ যে দলের নেই, সেই দলের প্রতিষ্ঠাতা এই মহান নেতা এমন কিসের শক্তি দিয়ে গেছেন যাতে বলীয়ান হয়ে আমাদের দল ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি করে চলেছে। আজ দেশের ২২টি রাজ্যে দলের সংগঠন গড়ে উঠেছে। দেশের বাইরেও এই মহান নেতার শিক্ষা, এ যুগের শ্রেষ্ঠ মতবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা সেখানকার বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করছে, অনুপ্রাণিত করছে। সেই শিক্ষারই আকর্ষণে আজ এই সভায় এই দুর্যোগ, এই প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে এই বিরাট সমাবেশে আপনারাও শুনছেন গভীর আবেগ এবং শ্রদ্ধা সহকারে। সেই অমূল্য শিক্ষার ভিত্তিতেই আমি কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে বলব।

প্রথমেই মনে পড়ছে,১৯৬৭ সালে একটি বক্তৃতায় খুব দুঃখের সাথে এই মহান নেতা যা বলেছিলেন, আজ তা অত্যন্ত মর্মান্তিক সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। তিনি বলেছিলেন, *"আমরা ছিন্নমূল হয়ে পড়েছি। সংস্কৃতির যে উচ্চ সুরটা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে তৈরি হয়েছিল আমরা তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছি না। বড় কথাগুলি আমরা বিশ্বের থেকে আহরণ করেছি, কিন্তু দেশের মাটিতে গড়ে ওঠা উচ্চ সংস্কৃতির সঙ্গে আমরা যেন যোগসূত্র*

হারিয়ে ফেলেছি। আজকের দিনে রাজনৈতিক আন্দোলন, গণআন্দোলন, সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে নীতি-নৈতিকতার, রুচিসংস্কৃতির উচ্চ মানটা নেমে গেছে। যে উচ্চ মানটা একসময় এ দেশে গড়ে উঠেছিল তা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। ফলে আমরা ছিন্নমূল হয়ে গিয়েছি। আমরা বড় কথা বলি, কিন্তু বড় হৃদয়বৃত্তির কারবার করি না।'[১]

বিদ্যাসাগরের মতো অতীতের বড় মানুষদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়েই এগোতে হবে

এই প্রসঙ্গে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মাত্র কয়েকদিন আগে ২৯ জুলাই একটি ঐতিহাসিক স্মরণীয় দিবস চলে গেল। এ দেশের কয়জন তা স্মরণ করেছে? এই বাংলার স্কুলে, কলেজে, ঘরে ঘরে, পল্লীগ্রামে, শহরের পাড়ায় পাড়ায়, ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে আজ ক'জন জানে তাঁর নাম? এই দিনটিতেই ১২৫ বছর আগে মহান মানবতাবাদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। অথচ ক'জন আজ তাঁকে জানে, ক'জন আজ তাঁকে স্মরণ করছে? আজ আমরা যে যথার্থই ছিন্নমূল হয়ে গিয়েছি, আমরা যে অতীতের সাথে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছি, এই কথাটা বড়ই মর্মান্তিক সত্য! অথচ মহান চিন্তানায়ক বিদ্যাসাগর না থাকলে ভারতবর্ষের নবজাগরণ নেই, স্বাধীনতা আন্দোলন নেই, শিক্ষার অগ্রগতি বলতে যা বোঝায় কোনও কিছুই ঘটত না। বিদ্যাসাগর না থাকলে কমরেড শিবদাস ঘোষকেও আমরা পেতাম না। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন, বিদ্যাসাগর ভারতবর্ষের নবজাগরণ থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত এই গৌরবময় যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, একেবারে নিখাদ চরিত্রসম্পন্ন মহান মানুষ, এ দেশে সেক্যুলার মানবতাবাদী চিন্তার প্রবর্তক। এ দেশে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, দেশবন্ধু, ক্ষুদিরাম, সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং, সূর্য সেন, প্রীতিলতা হতে শুরু করে যত চিন্তানায়ক, মহান বিপ্লবী যোদ্ধা, যত শহিদ—সকলেরই ছাত্র হিসাবে কৈশোরে কমরেড শিবদাস ঘোষ যাত্রা শুরু করেছিলেন। তিনি সমস্ত যুগের বড় মানুষদের, এমনকী ধর্মপ্রচারকদের জীবনসংগ্রাম থেকেও শিক্ষা নিয়েছিলেন। আমাদেরও শিক্ষা নিতে বলেছিলেন। আবার তিনি এ যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ মার্কসবাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং মার্কসবাদকে গ্রহণ করে মহান মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুঙ-এর সুযোগ্য ছাত্র হিসাবে যাত্রা শুরু করে নিজেই মার্কসবাদকে আরও বিকশিত করেছেন, উন্নত করেছেন, যাকে আমরা বলি

'শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা'। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন অতীতের বড় মানুষদের জীবনসংগ্রাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আরও এগিয়ে যেতে। তাই আজ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আমার নিজের জন্য ও আপনাদের জন্য কয়েকটি কথা বলব, যেহেতু তাঁর স্মৃতিকে প্রায় বিলুপ্ত করা হয়েছে।

কমরেড শিবদাস ঘোষই বিদ্যাসাগরকে আমাদের চিনিয়েছেন। আপনারা জানেন, রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ দেশবন্ধু শরৎচন্দ্র হতে শুরু করে সুভাষচন্দ্র তিলক লালা লাজপৎ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র কবি নজরুল এবং সেই যুগের সকল স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শহিদেরা সকলেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করেছিলেন। রামকৃষ্ণ জানতেন বিদ্যাসাগর ভগবান মানেন না, পূজা মানেন না, তবুও রামকৃষ্ণ পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য। আমন্ত্রণ করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে কালী মন্দিরে একবার যাওয়ার জন্য। বিদ্যাসাগর সাড়া দেননি, যাননি, যেহেতু এসব বিশ্বাস করতেন না। এই বিদ্যাসাগর সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, — "আমি সাহিত্য কিছু করেছি এ কথা যদি এদেশের লোক কিছু স্বীকার করে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাকে স্বীকার করতে হবে, সে সাহিত্যের দ্বার উদঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।... তিনি বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।"[২] রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি অনুযায়ী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যের দ্বার উদঘাটন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জল পড়ে, পাতা নড়ে আদি মহাকবির এই রচনা থেকে আমি জানতে পেরেছি ছন্দ, মীড়, ঝঙ্কার।"[৩] রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, "আমাদের দেশের লোকেরা একদিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে থাকতে পারেননি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহত্ত্বগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা ঢেকে রাখতে চান,...। দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব অজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় মনুষ্যত্ব।"[৪] এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ শ্রদ্ধাঞ্জলি। শরৎচন্দ্র তো সারা জীবন তাঁর অসাধারণ সাহিত্য রচনায় বিদ্যাসাগরের আদর্শ ও সংগ্রামকে প্রতিফলিত করেছেন এবং সেটা নিজেই ব্যক্ত করেছেন। এই বিদ্যাসাগরকে আপনারা আজ ক'জন জানেন? এমনই হয়েছে দেশের উন্নয়ন! সেই যুগে তিনি পায়ে হেঁটে কলকাতায় এসেছিলেন। তখন আজকের মতো যানবাহন ছিল না। এই কলকাতার বুকে রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে ছিলেন। প্রথম জীবনে সংস্কৃত পাঠ করে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়েছিলেন। ২২ বছর বয়সে তিনি প্রথম ইংরেজি পড়ে পশ্চিমী সভ্যতার ও

নবজাগরণের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। ইউরোপে তখন ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধে লড়াই হচ্ছে। ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত মানবতাবাদ বা সেক্যুলার হিউম্যানিজম যাকে আমরা বলি, তার আন্দোলনের জোয়ার চলছে, গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনের জোয়ার চলছে— বিদ্যাসাগর সেই নবজাগরণ, ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত মানবতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সংস্কৃতে শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে যিনি বিদ্যাসাগর এবং পণ্ডিত উপাধি পান, সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংরেজ সরকারকে জানান, "কতগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হচ্ছে। ...কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন, তা আর বিবাদের বিষয় নয়। আমাদের উচিত সংস্কৃত পাঠক্রমে এগুলি পড়াবার সময়ে, এদের প্রভাব কাটানোর জন্য ইংরাজী পাঠক্রমে খাঁটি দর্শন দিয়ে এগুলি বিরোধিতা করা। ... যেখানেই আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞানের আলো পৌঁছেছে, এবং যতটুকু পৌঁছেছে, সেখানে ততটুকু এদেশীয় শাস্ত্রীয় বিদ্যার প্রভাব কমছে। ফলে এই শিক্ষার প্রসার বাড়াতে হবে। ...এমন শিক্ষক চাই, যারা বাংলা ভাষা জানে, ইংরাজী ভাষা জানে, আর ধর্মীয় সংস্কার মুক্ত।"[৫] বিদ্যাসাগর যেসব পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন, তাতে ভগবান, অবতার তত্ত্ব বা অলৌকিক ঘটনা ইত্যাদি ছিল না। বরং এসবের প্রভাব মুক্ত করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। বর্তমানে দেশের শাসক শ্রেণি ধর্মীয় শিক্ষার উপরই গুরুত্ব দিচ্ছে! বিদ্যাসাগরের এসব মতামত জেনেও কিন্তু রামকৃষ্ণ তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, আমার সামনে আদর্শ দু'জন, একজন রামকৃষ্ণ আর একজন বিদ্যাসাগর। কারণ কী? কারণ বিদ্যাসাগরের জীবনের আপসহীন মহৎ সংগ্রাম। বিদ্যাসাগর পায়ে হেঁটে, চাঁদা সংগ্রহ করে অসংখ্য স্কুল স্থাপন করেছিলেন জ্ঞানের আলো পৌছে দেওয়ার জন্য। ঋণগ্রস্ত হয়েও স্কুল স্থাপন করেছিলেন। ছাত্ররা বিএ, এমএ পাশ করে, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বড় বড় চাকরি করে প্রচুর অর্থ রোজগার করবে, গাড়ি-বাড়ি করবে— এই উদ্দেশ্যে তিনি এসব করেননি। এ দেশের ছেলেমেয়েরা সত্যিকারের মানুষ হোক, মনুষ্যত্ব নিয়ে দাঁড়াক, সেটাই বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন। এই বিদ্যাসাগর আত্মমর্যাদাবোধ কাকে বলে তার অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। আপনাদের কেউ কেউ জানেন, অনেকে জানেন না। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ একজন ইংরেজ সাহেব, 'কার' তাঁর নাম। তাঁর সাথে বিদ্যাসাগর দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেই সাহেব জুতোসহ পা টেবিলে তুলে বসে বিদ্যাসাগরকে অভ্যর্থনা জানান। পরে এই সাহেব সংস্কৃত কলেজে আসেন। বিদ্যাসাগর

টেবিলের ওপর নিজের চটিসহ পা তুলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। কার সাহেব বড়লাটের কাছে অভিযোগ জানান। বিদ্যাসাগর বলেন, আমরা জানতাম আমরা অসভ্য, ইংরেজরা সভ্য। ইংরেজদের থেকে সভ্যতা শিখতে হবে। ফলে কার সাহেবের কাছে যে সভ্যতা শিখেছি, সেই সভ্যতা অনুযায়ীই আমি তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছি। এই ছিলেন বিদ্যাসাগর!

বিদ্যাসাগরের সাথে কর্তৃপক্ষের বারবার মতভেদ হয়েছিল। এই মতভেদের কারণেই তিনি সংস্কৃত কলেজের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন তিনি ঋণগ্রস্ত। অন্যরা প্রশ্ন তুলল, বিদ্যাসাগর খাবেন কী? বিদ্যাসাগর বললেন, 'আমি আলু-পটলের দোকান করব, মুদি দোকান করব। দরকার হলে একবেলা খাব, নুনভাত খাব। কিন্তু যে চাকরিতে সম্মান নেই, সেই চাকরি করব না'। সেই যুগে মর্যাদাবোধের এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন বিদ্যাসাগর। আজ কয়জন এরকম পারে! ছোটলাটের সাথে দেখা করতে হলে কারা বিনা বাধায় যেতে পারে তার তালিকা ছিল। বিদ্যাসাগরের নাম ছিল বিনা বাধার তালিকায়। বিদ্যাসাগর বলে দিলেন, 'আমার নাম কেটে দিন। যেখানে সর্বসাধারণের সুযোগ নেই সেখানে আমি যাব না'। তাঁর লিখিত 'কথামালায়' গল্পচ্ছলে এই নীতি শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, যা শুধু সে যুগেই নয়, আজকের লোভ-লালসার দাস্যবৃত্তির যুগে আরও প্রয়োজন। একটি শেকলে বাঁধা কুকুর প্রভুর বাড়িতে প্রচুর লোভনীয় খাদ্য পায়, আর একটি বাঘ অনাহারে থেকে শুকিয়ে যাচ্ছে। কুকুরটি বাঘকে শেকলে বাঁধা জীবনে আসার লোভনীয় প্রস্তাব দিল। তার উত্তরে বাঘ জানাল, 'নিতান্ত পরাধীন হইয়া রাজভোগে থাকা অপেক্ষা স্বাধীন থাকিয়া অনাহারের ক্লেশ পাওয়া সহস্র গুণে ভালো'। একবার ভেবে দেখুন, অশিক্ষিত, নিরন্ন সাধারণ মানুষের কথা বাদ দিলাম, এইসময়কার তথাকথিত কয়জন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাও এরকম ভাবতে বা বলতে পারেন! এই ছিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর বসে আছেন এক বড়লোকের বাড়িতে। উপরে হাতটানা পাখা চলছে। খ্যাতনামা সব লোক। একজন দারোয়ান একটা চিঠি নিয়ে এল। দরদর করে ঘাম ঝরছে। বিদ্যাসাগর তাকে পাশে বসাতে চাইলেন। সে লজ্জায় বসবে না। জোর করে বসালেন। কিছুক্ষণ বাদে সে চলে গেল। বাকিরা রেগে বলল, আপনি একজন দারোয়ানকে আমাদের সাথে বসিয়েছেন, এ তো আমাদের প্রতি অসম্মান। বিদ্যাসাগর জানতে চাইলেন, কোন মতে উত্তর দেব? তোমাদের মতে যদি উত্তর দিই তবে এই দারোয়ান মৈথিলি ব্রাহ্মণ। তোমাদের বাপঠাকুরদাদারা এদের পায়ের ধুলো নিত। আর আমার মত হল, আমরা চারশো-পাঁচশো টাকা

বেতন পাই এখন, আর ও পায় পাঁচ টাকা। আমার বাবাও একদিন কলকাতা শহরে পাঁচ টাকা বেতনে চাকরি করেছিলেন। এই ছিলেন বিদ্যাসাগর! বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনে জাতীয় কংগ্রেস তখন সবে গড়ে উঠেছে। উদ্যোক্তাদের হালচাল দেখে তিনি তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে বলেছেন, 'বাবুরা বক্তৃতা দিচ্ছে, দেশোদ্ধার করছে, অথচ দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে তার খোঁজ রাখে না'। এই কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তাঁকে এক সভায় আমন্ত্রণ জানালে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে তরোয়াল ধরতে পারবে?' তাঁরা উত্তর দিতে না পারায় বললেন, 'আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা এগোও'। কী অসাধারণ দূরদৃষ্টিতে সেদিন তিনি আপসপন্থীদের চিনতে পেরেছিলেন, পরবর্তী ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিয়ে গেছে।

শেষজীবনে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তাঁকে পুনরায় কারমাটারে যেতে বলা হল। তিনি বললেন, আমি যাব না। আমি দেখেছি, ওখানে সাঁওতালরা দিনে এক সের চাল, আধ সের ডাল, আলু এইসব খেত। এখন এক ছটাক ছাতুও তাদের জোটে না। অনাহারে কাটাচ্ছে। আর ওখানে গিয়ে আমি ভাল জিনিস খাব— এ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেঁদে ফেললেন, গেলেন না। তার কিছুদিন বাদেই মারা যান। এই বিদ্যাসাগরই একদিন অতি দুঃখে বলেছিলেন, "দরিদ্রের দুঃখ কয়জন দেখিয়াছে, তাঁহাদের হৃদয়ের ব্যথা কয়জন বুঝিয়াছে।"[৬] এই হচ্ছে বিদ্যাসাগরের চরিত্র। আপনারা জানেন বিদ্যাসাগর তাঁর একমাত্র ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন সে তার স্ত্রীকে অসম্মান করেছিল বলে। বিদ্যাসাগরের যতটুকু সম্পত্তি ছিল ৪৫ জন অভাবি পরিবারকে ভাগ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের সেই উইল বিখ্যাত হয়ে আছে। দাতব্য চিকিৎসালয়, অমুক স্কুল, অমুক বিধবা মা, অমুক বিধবা কন্যা, অমুক বৃদ্ধ— এইভাবে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে দিয়ে যান। এরপর আর একটি ঘটনা শুনলে আপনারা চমকে উঠবেন। ১৯২৫ সালের ১৯ এপ্রিল আনন্দবাজার পত্রিকায় সেই সময়ের এক মহিলা ডাক্তার বিধুমুখী চৌধুরী একটা আবেদন রাখেন। তিনি বলেন, "বিদ্যাসাগরের মধ্যম কন্যা আমার কাছে এসেছিলেন আর্থিক সাহায্যের জন্য। তাঁকে দেখার কেউ নেই। তাঁর কাছে শুনলাম বিদ্যাসাগরের কনিষ্ঠা কন্যা কাশীতে কার বাড়িতে কাজ করে পেট চালায়। অথচ এ দেশে এমন কোনও লোক নেই যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিদ্যাসাগরের সাহায্য পায়নি।"[৭] এভাবে তিনি দেশবাসীর কাছে বিদ্যাসাগরের কন্যাদের জন্য সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। আমি বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, বাল্যবিবাহ রোধ এইসব আন্দোলনের বিষয় আজ আর উল্লেখ করলাম না।

আমাদের দিল্লির নেতারা, রাজ্যের নেতারা যে যখন সরকারি ক্ষমতায়, সকলেই ঘোষণা করছে দেশের খুব উন্নয়ন হচ্ছে। এই কি সেই উন্নয়ন! ২৯ জুলাই ভারতের এই শ্রেষ্ঠ সন্তানকে স্মরণ করা হল না কেন?

দেশের উন্নয়ন, মহত্ত্ব কী দিয়ে বিচার হবে

উন্নতি কাকে বলে? আমি যদি ধরেও নিই দেশের খুব আর্থিক অগ্রগতি হচ্ছে, কিন্তু তাতে মানুষ তৈরি হচ্ছে কি, উন্নত চরিত্র সৃষ্টি হচ্ছে কি? যথার্থ বড় কে? যার টাকা অনেক, গাড়িবাড়ি অনেক, সেই লোক বড় না চরিত্র বড়, মনুষ্যত্ব বড়? কোনটা দিয়ে বড়ত্ব বিচার হবে? একটা দেশেরও বড়ত্ব কী দিয়ে বিচার হবে? অগ্রগতি কী দিয়ে বিচার হবে? সেই দেশের মানুষের চরিত্র, মনুষ্যত্ব, নৈতিকতা কতটা এগোচ্ছে তা দিয়েই তো নির্ধারিত হবে।

আর পাঁচদিন বাদেই আসবে আরেকটা দিন, ১১ আগস্ট। আমরা যখন মায়ের কোলে, গোটা বাংলার, ভারতবর্ষের মায়েরা তাঁদের চোখের জলের সাথে সেই গান 'একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি' গাইত। এই ক্ষুদিরামকে স্মরণ করেই নেতাজি সুভাষচন্দ্রের যাত্রা শুরু। তখন তিনি কটকে র‍্যাভেনশ স্কুলের নিচু ক্লাসের ছাত্র। তাঁর শিক্ষক শ্রদ্ধেয় বেণীমাধব দাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সুভাষচন্দ্র তখন ১১ আগস্ট অরন্ধন, অনশন করে উদযাপন করেছিলেন। এই ১৮ বছরের কিশোর গোটা ভারতবর্ষকে সেদিন জাগিয়েছিলেন। আদালতে বিচারকের রায় শুনে হেসেছিলেন। ফাঁসির মঞ্চে উঠেও হেসেছিলেন। যেখান থেকে 'হাসি হাসি পরব ফাঁসি' কথাটা এসেছিল। আপনারা অনেকেই জানেন না, শহিদ-ঈ-আজম ভগৎ সিং-এর যেদিন ফাঁসি হবে, জেলের আরেক বন্দি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার আত্মীয়রা কেউ এল না? আসলে তাঁর আত্মীয়রা জানতেন না সেদিন ফাঁসি হবে। কারণ, তাঁর ফাঁসি হওয়ার কথা ছিল ২৪ মার্চ, গান্ধীজির অনুরোধে ২৩ মার্চ করা হয়। ফলে আত্মীয়রা জানতে না পেরে আসেননি। ভগৎ সিং বললেন, 'আমার আত্মীয় শহিদ ক্ষুদিরাম, শহিদ কর্তার সিং সারাভা'। কর্তার সিং সারাভা ছিলেন পাঞ্জাবের আর একজন অমর শহিদ। ভগৎ সিং বলছেন, 'আমার রক্ত হচ্ছে ক্ষুদিরামের রক্ত। একই রক্তের থেকে আমরা এসেছি।' আজ দেশের নাকি প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে, অথচ কে এঁদের স্মরণ করে? কে স্মরণ করে দেশবন্ধুকে, সুভাষচন্দ্রকে? এমনকী রবীন্দ্রনাথকে কে স্মরণ করে? রবীন্দ্রনাথ বেঁচে আছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে, তাও প্রেম, প্রকৃতি, ঈশ্বর সম্পর্কিত গান নিয়ে। কয়জন জানে জন্মদিনের শেষ ভাষণ 'সভ্যতার সঙ্কট'-এ রবীন্দ্রনাথ অতি

দুঃখে বলেছিলেন, "নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টনী থেকে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র আমার সম্মুখে উদঘাটিত হয়েছিল, তা হৃদয়বিদারক। একদিন আমার জীবনের প্রারম্ভে ইউরোপীয় সভ্যতাকে আমি হৃদয় থেকে গ্রহণ করেছিলাম। আজ ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি আমার বিশ্বাস দেউলিয়া হয়ে গেছে।"[৮] রবীন্দ্রনাথ গোটা স্বদেশি আন্দোলনের যুগে চেয়েছিলেন, স্বাধীনতা আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে হোক। এই অর্থে তিনি গান্ধীজির সমর্থক ছিলেন। তিনিই শেষজীবনে লিখলেন, "নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস। শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস। যাবার আগে তাই ডাক দিয়ে যাই, দানবের সাথে সংগ্রামের তরে, প্রস্তুত হতেছে যারা ঘরে ঘরে।"[৯] শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা পরিবর্তিত হচ্ছিল। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, "...সভ্যতার এই ভিত্তি বদলের প্রয়াস দেখেছিলাম রাশিয়া গিয়ে। ...নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি। ...নব্য রাশিয়া মানব সভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তুলবার সাধনা করছে, সেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা আপনিই জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক।"[১০] এই রবীন্দ্রনাথকে এখনকার রবীন্দ্রপ্রেমিকরা চেনেন, জানেন, স্মরণ করেন? শরৎচন্দ্রকে কে চেনেন? শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' গোটা ভারতবর্ষে একদিন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি দেখিয়েছিলেন বিপ্লবের পথ কী দাবি করে? ভয় পেয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বইটি বেআইনি ঘোষণা করেছিল, কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে সারা দেশের মানুষ বইটি পড়ত, অনুপ্রাণিত হত। তিনি এই পুস্তকে শ্রমিক বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছিলেন। শ্রীকান্ত উপন্যাসে শরৎচন্দ্র দেখালেন, রেলের মাটি কাটছে যে শ্রমিক, তারা মদ খায় আর নোংরা ফূর্তি করে, আজ যেটা বহু ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায় আপনারা দেখছেন, শরৎচন্দ্র সেই যুগে তার সূচনা দেখে গেছেন। একটি শিশু কলেরায় মারা যাচ্ছে, মুখে একফোঁটা জল দেওয়ার কেউ নেই। বলেছিলেন, গ্রামে থাকতে এরা এরকম ছিল না। পাড়া প্রতিবেশীর বিপদে পাশে এসে দাঁড়াত। আজ তাদের সেই মন নেই। বলেছেন, 'সভ্যতার অজুহাতে ধনীর ধনলোভ মানুষকে হৃদয়হীন পশুতে পর্যবসিত করেছে।' পুঁজিবাদী সভ্যতাকে এভাবে ধিক্কার জানাচ্ছেন। তারপরে বললেন, 'মানুষের মরণ আমাকে ব্যথা দেয় না, আমি জানি মানুষ জন্মালেই মরে। ব্যথা পাই মনুষ্যত্বের মরণ

দেখলে।' শ্রমিকদের বলছেন, যে সভ্যতা তোমাদের এই সর্বনাশের পথে নিয়ে এসেছে যদি বহন করতে হয়, তাকে অতি দ্রুত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাও। এই সব কথা একদিন বাংলার যৌবনকে আলোড়িত করত, ভারতবর্ষের যৌবনকে আলোড়িত করত। এই সব পড়েই তো সূর্য সেনরা, প্রীতিলতারা, বিনয়-বাদল-দীনেশরা এগিয়ে এসেছিলেন। আজ এঁদেরকে কে স্মরণ করে? কেন স্মরণ করে না? এটা কি দেশের উন্নয়ন? এটা কি দেশের অগ্রগতি? কেন এই আক্রমণ? তার উত্তর দিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষের শাসক সম্প্রদায় জাতির সেই নৈতিক চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা অত্যন্ত ধুরন্ধর। তারা জানে যে, শত অত্যাচার দমন-পীড়ন করেও, না খেতে দিয়েও একটা জাতিকে, একটা দেশের জনসাধারণকে শুধু পুলিশ আর মিলিটারির সাহায্যে বেশিদিন পদদলিত করে রাখা যায় না। সমস্ত যুগের স্বৈরাচারী শাসকদের অত্যাচারের ইতিহাস একটা কথা বাতলায় যে, শোষণ এবং দমন দিয়ে, পুলিশ শাসন ও মিলিটারি দিয়ে শেষ পর্যন্ত জনশক্তিকে দমানো যায় না, ক্ষমতা রক্ষা করা যায় না। জনশক্তি মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়ায়, যদি তারা সঠিক বিপ্লবী আদর্শের সন্ধান পায় এবং তাদের নৈতিক বল অটুট থাকে।"[১১] এই কথা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন। আজকে আমাদের দেশের মর্মান্তিক পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে দেখুন, কমরেড ঘোষের এই ওয়ার্নিং কত সঠিক !

শাসকরা যুবসমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চায়

সম্প্রতি এক কিশোরের মৃত্যু নিয়ে সংবাদপত্রে আলোড়ন চলছে। স্কুলের বাচ্চা ছেলেমেয়েরা জন্মদিন পালন করছে মদের আসর বসিয়ে। স্কুলে-কলেজে এখন মদচর্চা, পাড়ার ক্লাবে ক্লাবে মদচর্চা, রাস্তার মোড়ে মোড়ে মদচর্চার জোয়ার চলছে, নানা ড্রাগ আসক্তির চর্চা চলছে। অথচ একদিন এ দেশে স্বদেশি আন্দোলন শুরু হয়েছিল মাদক দ্রব্য বর্জন দিয়ে। আর এখন সরকার বলছে, মদের দোকান আরও বাড়াও। কেন্দ্রীয় সরকার চায় মদের প্রসার বাড়ুক। সিপিএম যখন এ রাজ্যে সরকারে ছিল তারা মদের দোকান বাড়িয়েছে, আরও মদের দোকান বাড়াচ্ছে বর্তমান তৃণমূল সরকার ট্যাক্স থেকে সরকারের আয় বাড়বে এই অজুহাতে। স্কুল-কলেজের বহু ছেলেমেয়েদের কাছে এখন মদ খাওয়া প্রায় এক গ্লাস জল খাওয়ার মত দাঁড়িয়েছে। শাসক সম্প্রদায়ের লক্ষ — মদ খাও, গাঁজা খাও, ড্রাগ খাও, নেশা করো ; ভুলে যাও বিদ্যাসাগরকে, ভুলে যাও বিবেকানন্দকে, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রকে,

দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্রকে। আমাদের ছোটবেলায় আমাদের শিক্ষকরা, অভিভাবকরা এইসব মনীষীদের নাম শুনিয়ে বলতেন, এঁরা প্রাতঃস্মরণীয়। এইভাবে জীবনপ্রভাতে আমাদের মনে মহতের প্রতি আকর্ষণ জন্মাত। না হলে কমরেড শিবদাস ঘোষকেও আমরা চিনতে পারতাম না, জানতাম না। আজ গোটা দেশে স্বদেশি আন্দোলনের গৌরবময় ঐতিহ্য, নবজাগরণের ঐতিহ্যকে শাসক সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করছে। সেই যুগের মহৎ চরিত্রগুলিকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিচ্ছে। এখন আদর্শ স্থাপন করা হচ্ছে ফিল্মস্টার, নায়ক-নায়িকাদের। তাদের নোংরা প্রেম কাহিনী, নগ্নচিত্র আর খেলোয়াড়দের কাহিনী ঢালাও প্রচার করা হচ্ছে। টিভির মাধ্যমে নোংরা সিনেমা, ব্লু-ফিল্ম, মোবাইলের মাধ্যমে এবং আরও কত নোংরা পথে এ সব করা হচ্ছে। যত মদের স্রোত বাড়ছে, তত নারীর জীবন বিপন্ন হচ্ছে। এই যে ধর্ষণ, গণধর্ষণ, খুন এইসব জিনিস বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন? রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন? ব্রিটিশ ভারতে এসব ছিল? তিন বছরের শিশুকন্যা তাকে পর্যন্ত ধর্ষণ করে খুন করছে। ৬০ বছরের বৃদ্ধা মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন করছে। গণধর্ষণ করছে। প্রেমের নাম করে প্রতারণা করে হোটেলে তুলে বন্ধুদের দিয়ে গণধর্ষণ করাচ্ছে এবং তার ছবি তুলছে, সে ছবি বাজারে বিক্রি করছে। এমন খবরও বেরোচ্ছে মেয়ে বাবার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তুলছে। পরিস্থিতি এমন ভয়ংকর যে কিছু হলেও ক্লাস ফোর-ফাইভের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত নোংরা সেক্সে জড়িয়ে পড়ছে। এ ছাড়া মানুষকে মনুষ্যত্ব বর্জিত এবং লোভ-লালসা-ভোগের এমন শিকার করা হচ্ছে যে, টাকার লোভে নিজের মেয়েকে, স্ত্রীকে, বোনকে পর্যন্ত বিক্রি করে দিচ্ছে, বৃদ্ধ বাবা-মাকে পথে বসিয়ে দিচ্ছে, খুন করছে সম্পত্তির লোভে। এমনকী গ্রামীণ জীবনে অতীতের সংস্কৃতির যতটুকু ধ্বংসাবশেষ ছিল, তাও লুপ্তপ্রায়। এমনিতেই বহুদিন আগেই পুঁজিবাদ কৃষি অর্থনীতিকে গ্রাস করেছে। গ্রামের শাক-শব্জি হতে সব কিছু পুঁজিবাদী জাতীয় বাজারের পণ্য, গ্রামের ছোট মুদি দোকানও চলে শিল্পজাত জাতীয় বাজারের সাপ্লাইয়ে। রাস্তা-ঘাট-পরিবহন সব কিছু মূলতঃ এই জন্যই। একই সাথে কর্মহীন লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ যুবক-যুবতী আজ জাতীয় বাজারের পণ্য, কাজের খোঁজে হন্যে হয়ে আজ এ শহরে কাল ও শহরে ছুটছে। এরা হচ্ছে মাইগ্রেন্ট লেবার। সংস্কৃতিটাও তাই। চলমান অস্থায়ী জীবনে এদের সংসারও টলমল করছে। গ্রামে স্ত্রী-সন্তান থাকতেও এরা অনেকেই বাইরে আলাদা সঙ্গিনী খুঁজে নিচ্ছে। কেউ কেউ ফিরেও আসে না। যারাও মাঝে মাঝে আসে শহর থেকে নোংরা কালচার নিয়ে গ্রামকে কলুষিত করছে। নারী

পাচারকারীদের যারা সাপ্লাই দেয়, তারা গ্রামেরই লোক, আবার শহরেও বেশ বিলাসী জীবন যাপন করে। এমনকী অভাবী পরিবারের একদল মেয়ে— কিছুদিন বাদে বাদে শহরে গিয়ে রোজগার করে আনে, তাদের অনেকে যেমন পরিচারিকা সহ নানা রোজগার করে, আর একদল বিপথে রোজগার করে, বাড়ির লোক জেনেবুঝেও চুপ করে থাকে। গ্রামীণ জীবনের পূর্বেকার সরলতা, পারিবারিক দায়িত্ববোধ, প্রতিবেশীর বিপদে পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা, ভোগ-বিলাস বর্জিত অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা— সবকিছু পুঁজিবাদ ধ্বংস করছে। কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি! স্নেহ-মায়া-মমতা-বিবেকদংশন লুপ্তপ্রায়। বিজেপির রাজত্বে, কংগ্রেস রাজত্বে, সিপিএমের রাজত্বে, তৃণমূলের রাজত্বে এই হচ্ছে দেশের উন্নয়ন!

ধর্ম আজ আর নৈতিকতা দিতে পারে না

এটা কি এমনি এমনি ঘটছে? এটা কি ইতিহাসের অনিবার্য নিষ্ঠুর পরিণতি? কমরেড শিবদাস ঘোষ বলে গেছেন, এটা শাসক সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র। এরা চায় মনুষ্যত্ব ধ্বংস হোক, নৈতিক বল ধ্বংস হোক, মানুষ অমানুষ হোক। যারা ধর্ষণ করে, গণধর্ষণ করে তারা তো এই চরিত্র নিয়ে জন্ম নেয় না। এই চরিত্র কোথা থেকে পায়? জন্তু জান্তব চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্ম নেয়। কিন্তু মানুষ মানুষের চারিত্রিক-নৈতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্ম নেয় না। দেহের বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্ম নেয় । বিবেক, প্রবৃত্তি, ন্যায়-অন্যায়বোধ সে সমাজ থেকে পায়, সামাজিক জীবন থেকে পায়, সামাজিক নৈতিকতা থেকে পায়। আজ পাচ্ছে না কেন? কারণ, ধর্ম আজ আর নৈতিকতা দিতে পারে না। একসময় ধর্ম সুদূর অতীতে যখন দাসপ্রথার বিরুদ্ধে, সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছিল, তখন ধর্ম মূল্যবোধ ও নৈতিকতা দিয়েছিল। ধর্মকে ভিত্তি করেই তখন অনেক বড় মানুষ সমাজে এসেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের নিয়মেই এক যুগের প্রগতিশীল ও কল্যাণকারী আদর্শ ও নৈতিকতা পরবর্তী যুগে প্রতিক্রিয়াশীল, অকল্যাণকারী হয়ে যায়, যখন সে আর প্রচলিত অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে না লড়ে বরং তার রক্ষক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ইতিহাসের গতিপথে যখন ধর্ম প্রাণহীন হয়ে গেল, ধর্ম যখন অধর্ম হয়ে দাঁড়াল, তখন ইউরোপীয় নবজাগরণ ধর্মভিত্তিক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধে আধুনিক বিজ্ঞানকে, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করেছিল। বস্তুবাদ, যান্ত্রিক বস্তুবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, সেক্যুলার হিউম্যানিজম, নবজাগরণের জোয়ার, বুর্জোয়া

মানবতাবাদী সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি এসব ধারণা ব্যাপক চিন্তাগত আন্দোলন রূপে সেই সময় দেখা দিয়েছিল ইউরোপে। যার প্রভাবে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার স্লোগান উঠল। দাবি উঠল, রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র চাই। প্রজারাই ঠিক করবে সংবিধান, আইন-কানুন, নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই তাঁদের নির্ধারিত সংবিধান অনুযায়ী দেশ চালাবে। এটাই ছিল রাজতন্ত্র বিরোধী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। তখন ছিল যৌবনোদ্দৃপ্ত পুঁজিবাদের প্রগতিশীল স্তর। বুর্জোয়া গণতন্ত্র এই সব ঘোষণা নিয়ে এসেছিল। জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণেরই— বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল এই আহ্বান এসেছিল। সেই সময় জরাজীর্ণ ধর্মীয় নৈতিকতার পরিবর্তে মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক নৈতিকতা এসেছিল, মনুষ্যত্বের নতুন বোধ এসেছিল। সেই সময় ইউরোপে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, দর্শনে অনেক দিকপাল মানুষ এসেছিলেন। আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের এই চিন্তার প্রভাবেই নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল, যার প্রতিনিধি ছিলেন রামমোহন-বিদ্যাসাগর, জ্যোতিবারাও ফুলে, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুলরা, রাজনৈতিক আন্দোলনে দেশবন্ধু, লালা লাজপত রাই, তিলক, সুভাষচন্দ্ররা এলেন। আরও অসংখ্য স্বাধীনতা যোদ্ধা ও শহিদরা এলেন। সেই সময় স্বদেশি আন্দোলন দিয়েছিল চরিত্র ও মনুষ্যত্ব, যদিও এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল আপসমুখী জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আদর্শ এবং তাকে ভিত্তি করে যে নৈতিকতা তখন কাজ করেছিল, তা এখন কার্যকারিতা হারিয়েছে। কারণ স্বাধীনতার জন্য লড়েছে এ দেশের সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ। কিন্তু নেতৃত্বে ছিল বুর্জোয়া শ্রেণি— টাটা-বিড়লারা। তাদের লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসকের পরিবর্তে তারা ক্ষমতা দখল করবে। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পরিবর্তে দেশীয় পুঁজিবাদী শোষণ কায়েম করবে। এই সম্পর্কে সেই সময়ই ওয়ার্নিং দিয়েছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র, শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং, শরৎচন্দ্র, নজরুল। কিন্তু দেশের বেশিরভাগ মানুষের কাছে এই হুঁশিয়ারি পৌঁছায়নি।

সাধারণ মানুষ রাজনীতি বুঝতে সেদিনও চায়নি, আজও চায় না, কোন দলের কী নীতি বুঝতে চায় না

কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে দু'টি ধারা ছিল। একটা আপসমুখী, আবেদন-নিবেদন, গান্ধীজি যার নেতা। আর একটা আপসহীন, বিপ্লবাত্মক। ক্ষুদিরাম থেকে শুরু, ভগৎ সিং, নেতাজি

সুভাষচন্দ্রে তার পরিণতি। এ দেশের শ্রমিকবিপ্লবভীত পুঁজিপতিরা গান্ধীজিকে সামনে রেখে জাতীয় কংগ্রেসের পিছনে টাকা ঢালল, খবরের কাগজে গান্ধীবাদীদের পক্ষে প্রচার দিল। সুভাষচন্দ্রসহ বিপ্লবীদের পক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও দেশীয় বুর্জোয়া কাগজ প্রচার দেয়নি। ফলে এ দেশের মানুষ গান্ধীজির নেতৃত্বের সাথে নেতাজির পার্থক্য কী, বিপ্লবীদের বক্তব্য কী তা জানতে পারেনি, বুঝতে পারেনি। অন্ধের মতো গান্ধীবাদী কংগ্রেসকে সমর্থন করেছে। এই নেতারাও চেয়েছে দেশের মানুষ অন্ধভাবে তাদের সমর্থন করুক। ফলে এ দেশের মানুষ রাজনীতি বোঝেনি। একটা কথা এখনও মানুষ দুঃখ করে বলে, সব দলই সমান, সকলেই ঠকায়। ভোটের আগে সব দলই অনেক বড় বড় কথা বলে, অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ভোটের পর যে যায় লঙ্কায় সে-ই হয় রাবণ। রামায়ণের কাহিনি অনুসারে রাম লঙ্কায় গিয়েছিল কিন্তু রাবণ হয়নি। লক্ষ্মণ সীতা হনুমান কেউই লঙ্কায় গিয়ে রাবণ হয়নি। কিন্তু রামায়ণে একটা শিক্ষা আছে। লঙ্কার যুদ্ধই হত না, সীতা যদি রাবণকে চিনতে পারত। রাবণ এসেছিল সন্ন্যাসীর বেশে প্রতারণা করার জন্য। সন্ন্যাসীর বেশ দেখে সীতা বিভ্রান্ত হয়েছিল। সে যুগেও বিপ্লববিরোধী কংগ্রেস নেতৃত্বকে এ দেশের মানুষ চিনতে পারেনি। বুঝতে পারেনি কেন ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিংকে গান্ধীজি মর্যাদা দেননি, কংগ্রেস মর্যাদা দেয়নি। বুঝতে পারেনি সুভাষচন্দ্রকে কেন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করতে হল। কেন সুভাষ বসুকে কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড করা হল।

সাধারণ মানুষ রাজনীতি বুঝতে সেদিনও চায়নি, আজও চায় না, কোন দলের কী নীতি বুঝতে চায় না। তাদের ভাবনাটা হচ্ছে, আমরা সাধারণ মানুষ ঘরসংসার করি, যা হোক নেতারা ঠিক করবে। কারা নেতা? খবরের কাগজে যাদের প্রচার খুব, রেডিওতে প্রচার খুব, তারাই নেতা। সেদিন যেমন সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য খবরের কাগজ, রেডিও প্রচার করত না। ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিংকে প্রচার করত না। গান্ধীবাদীদের অঢেল প্রচার করত। আজকেও দেখুন, খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি কমরেড শিবদাস ঘোষের কথা প্রচার করে না, আমাদের দলের বক্তব্যের প্রচার দেয় না। কারণ সেদিন পুঁজিপতিরা স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের ভয় করত, আজও তেমনি বিপ্লবী হিসাবে আমাদের দলকে তারা আতঙ্কের চোখে দেখে। আর মানুষ রাজনীতি বোঝে না, বিচার করে না। কাগজ, টিভি, রেডিও এসব দেখে ঠিক করে কার পেছনে ছুটবে। আর ‘উন্নয়ন’ ‘পরিবর্তন’ ‘আচ্ছে দিন’ ‘গরিবি হটাও’ — এই সব এক একটা স্লোগান ধুরন্ধর গদিসর্বস্ব দলগুলি তোলে, আর কাগজ, রেডিও, টিভি তার

প্রচার দেয়। তারপর কী হয় আপনারা চোখের সামনেই দেখছেন। বারবার ঠকছেন। এই নেতারাও রাবণের মতো দেশসেবকের ভেক ধরে মানুষকে ঠকায়।

আজকের যুগে প্রয়োজনীয় নতুন মূল্যবোধের সন্ধান দিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আজ এইভাবে যে নষ্ট হচ্ছে, মদ খাচ্ছে, নেশা করছে, নোংরা যৌনতায় মত্ত হচ্ছে, তা দেখে শিক্ষকরা, অভিভাবকরা, চিন্তাশীল মানুষেরা, আমরা সকলেই কষ্ট পাচ্ছি, উদ্বিগ্ন হচ্ছি। কিন্তু কেন এসব হচ্ছে? একটা কারণ, শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি, সরকারি দলগুলি ষড়যন্ত্র করে দেশের মহান চরিত্রগুলির স্মৃতি বিলুপ্ত করে দিচ্ছে এবং নোংরা পথে চালিত করে ছাত্রযুব শক্তির নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে। দ্বিতীয় কারণ, আগেই বলেছি যে, দাসপ্রথার যুগে যখন অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধর্মপ্রচারকরা দাসপ্রভুদের আক্রমণে বুকের রক্ত ঝরিয়ে, প্রাণ দিয়ে, অনাহারে থেকে ধর্মীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য, সমাজ কল্যাণের জন্য, মানুষের বিবেক জাগানোর জন্য ধর্মীয় বাণী প্রচার করত তখন ধর্মীয় মূল্যবোধ মনুষ্যত্ব দিয়েছিল। পরবর্তীকালে ইতিহাসের গতিপথে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে পরিচিত রাজারা ধর্মকে হাতিয়ার করে অত্যাচার চালাল, তখন ধর্ম প্রগতিশীল চরিত্র হারিয়ে মনুষ্যত্বের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল, ধর্মের নামে নানা অধর্ম অনাচার চালাতে থাকল, তখন রাজতন্ত্রবিরোধী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিবর্তে বুর্জোয়া মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রগতির ভূমিকা নিয়ে নতুন করে মনুষ্যত্ব জাগাল। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও আপসমুখী ও বিপ্লবী ধারা উভয়ের প্রভাবেই তৎকালীন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ-মানবতাবাদের আহ্বান নতুন নৈতিকতার সন্ধান দিয়েছিল। কিন্তু যে জাতীয় পুঁজিপতিরা সেদিন নিজেদের শ্রেণি স্বার্থে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে মদত দিয়েছিল আজ তারাই শাসকের ভূমিকা নিয়ে শোষণ লুণ্ঠন চালাচ্ছে 'জাতীয় স্বার্থের' দোহাই দিয়ে। তাই আজ দেখা যাচ্ছে, যত ধর্মীয় চর্চা বাড়ছে, জাতীয়তার স্লোগান উঠছে, ততই নৈতিক অধঃপতনও বাড়ছে। কারণ ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে ধর্মীয় নৈতিকতা ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তো লড়ছেই না, বরং তার সহায়কের ভূমিকা নিয়েছে, প্রগতিশীল চরিত্র হারিয়েছে। এক যুগের মূল্যবোধ যখন নতুন যুগের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যহীন হয়ে প্রগতির বিরোধী হয়ে অন্যায়-অত্যাচারের পক্ষে দাঁড়ায়, তখন

দেখা দেয় নতুন মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা। সেই জন্যেই সমাজে এই মূল্যবোধের সংকট। তাই আজকের যুগের প্রয়োজন নতুন মূল্যবোধ, সেটা হচ্ছে পুঁজিবাদবিরোধী সর্বহারা বিপ্লবী মূল্যবোধ। এ কথা আজ আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, এই সর্বহারা বিপ্লবী মূল্যবোধ আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ। যদিও আমাদের দলের উপযুক্ত শক্তি না থাকায় সর্বত্র এই মূল্যবোধের প্রচার করতে পারিনি। কিন্তু আমাদের দলের কর্মীরা যে এইসব মনীষীদের, শহিদদের স্মৃতি দিবস উদযাপন করে, তাঁদের থেকে শিক্ষা আহরণ করে আমাদের কর্মীরা কথাবার্তায়-চলনে-বলনে-আচরণে যে ভদ্রতা, শালীনতা, মনুষ্যত্ব বহন করে সেটা একমাত্র কমরেড শিবদাস ঘোষের দেওয়া এই সর্বহারা বিপ্লবী মূল্যবোধের অমূল্য শিক্ষার প্রভাবেই। যদিও আমাদের মধ্যে এক্ষেত্রে মান-এর পার্থক্য আছে। যে যতটা পারছি বহন করার সংগ্রাম করছি।

এই স্বাধীনতার জন্যই কি লড়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, শহিদেরা?

কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন, আমাদের সমাজ শ্রেণিবিভক্ত। পুঁজিপতি আর শ্রমিক, ধনী আর গরিব এভাবে বিভক্ত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আজ আর এক জাতি, এক জাতীয় স্বার্থ বলে কিছু নেই। হয় পুঁজিপতির স্বার্থ, না হয় শ্রমিকের স্বার্থ, হয় শোষকের স্বার্থ না হয় শোষিতের স্বার্থ— এভাবেই দেখতে হবে। দলকেও এভাবে বুঝতে হবে। যে কোনও দল হয় পুঁজিপতিশ্রেণির, না হয় শ্রমিকশ্রেণির। এভাবে শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দলকে বিচার করতে হবে। পুঁজিপতিরা— যারা প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টায়, প্রতি মিনিটে, প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন করছে, গোটা দেশকে ভিখারি বানাচ্ছে, তারা চায় যুক্তি মরুক, চিন্তা মরুক, বুদ্ধি মরুক, মানুষ প্রশ্ন করবে না, তর্ক করবে না, মানুষ তার ন্যায্য অধিকার কী জানবে না, বুঝবে না। তারা চায়, মানুষকে লোভী কর, স্বার্থপর কর, জন্তু-জানোয়ার বানাও, অমানুষ বানাও। আর পুঁজিবাদের সেবাদাস হচ্ছে সরকারি দলগুলো, সে বিজেপি হোক, কংগ্রেস হোক, তারা এ কাজ করছে। যতদিন সিপিএম ক্ষমতায় ছিল, তারাও এই কাজই করেছে। যার জন্য তাদের বিরুদ্ধেও আমাদের লড়তে হয়েছে। আজ তৃণমূলও একই কাজ করছে। তৃণমূল নেত্রী 'কন্যাশ্রী' বিতরণ করছেন ভোটের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু প্রতিদিন কত শিশুকন্যার বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হচ্ছে, কত নারী ধর্ষিতা হয়ে আর্তনাদ করছে, তার খোঁজ রাখেন কি? কত নারী পাচার হচ্ছে পশ্চিমবাংলা থেকে তার খোঁজ

রাখেন কি? কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, ক্লাবকে অনুদান, মেলায় উৎসবে দান, এ সব দানধ্যান করছেন আসলে ভোটের শ্রীবৃদ্ধির জন্য। আর এদিকে রাজ্য সরকার হাজার হাজার কোটি টাকায় ঋণগ্রস্ত। নরেন্দ্র মোদি ভোটের আগে বলেছিলেন, কালো টাকা উদ্ধার করে গোটা দেশে প্রত্যেকটি পরিবারে ১০০ দিনের মধ্যে ১৫ লক্ষ করে টাকা ব্যাঙ্কে পৌঁছে দেবেন। কী রকম পৌঁছে দিয়েছেন! কালো টাকার কারবারি কারা? চটকলের শ্রমিক, চা-বাগানের শ্রমিক কালো টাকা সঞ্চয় করে, ভাগচাষি কালো টাকা সঞ্চয় করে? কারা কালো টাকা সঞ্চয় করে? পুঁজিপতিরা করে, বড় বড় ব্যবসায়ীরা করে কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য। আর তারাই ভোটে কোটি কোটি টাকা ছড়ায় এইসব দলগুলিকে জেতাবার জন্য। তাই সরকারে বসে নেতারা কালো টাকার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না।

এই পুঁজিবাদই জনগণের শত্রু। আমাদের দেশের উন্নয়ন কী হচ্ছে! একদিকে রাষ্ট্রপতিই স্বীকার করছেন, ১২১ কোটি মানুষের দেশে ৬৬ কোটি বেকার। তা ছাড়া সরকারি কমিশনের হিসেব ৭৫ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকে, ৭৭ শতাংশ মানুষ দৈনিক ২০ টাকার বেশি খরচ করতে পারে না। এই হচ্ছে দেশের উন্নয়ন! অথচ আম্বানি, টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, জিন্দাল, আদানি এদের সম্পদের পরিমাণ দেখুন— লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা। বাড়ছে তো বাড়ছেই। কেন্দ্রীয় সরকার চলছে ঋণ করে। প্রায় ৬৯ লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ। ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার কোটি টাকা তার বাজেটে ঘাটতি। সেই কেন্দ্রীয় সরকার ৪ লক্ষ কোটি টাকার কর মুনাফাবাজ পুঁজিপতিদের মকুব করে দিল। এই পুঁজিপতিরা ব্যাঙ্ক থেকে ৮ লক্ষ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে নিল। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে শোধ দিচ্ছে না। আর সরকার পাবলিকের টাকা নিয়ে ব্যাঙ্ককে সেই টাকা দিচ্ছে। এ সরকার কার? কার জন্য 'আচ্ছে দিন' এনেছে? এই তো ১৫ আগস্ট ধূমধাম করে উদযাপন হবে, রাষ্ট্রপতি ভবনে, রাজভবনে। বহুতারাখচিত হোটেলে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, মন্ত্রীরা, এইসব নেতারা রাজকীয় ভোজসভা করে স্বাধীনতার উৎসব পালন করবে। একই সাথে দেখা যাবে, আর এক মর্মস্পর্শী চিত্র। অসংখ্য ক্ষুধার্ত শিশু ভোজসভা থেকে নিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করছে ডাস্টবিন থেকে। এই স্বাধীনতার জন্যই কি লড়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, শহিদেরা? লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ ঋণের জালে ফেঁসে, অনাহারে আত্মহত্যা করছে, আর এক বিজেপি মন্ত্রী বলছে, 'আত্মহত্যা করা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।' কতটা নিষ্ঠুর হলে এই নেতারা এমন কথা বলতে পারে!

পরিবর্তনের নামে তৃণমূল শাসন হচ্ছে সিপিএমের কার্বন কপি

কয়েক দিন আগে তৃণমূল নেত্রী বলেছেন, দু'চারজনের জন্য তাঁর দলের বদনাম হচ্ছে। মাত্র দু'চারজন সিন্ডিকেট করে, তোলাবাজি করে। তাঁর নিজের মনই কি বিশ্বাস করে এ কথা? আজ গোটা তৃণমূল দলটাই তো দাঁড়িয়ে আছে তোলাবাজদের উপরে, সিন্ডিকেটের উপরে, কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তাদের যতটা দায়িত্ব তার অনেক বেশি দায়িত্ব সিপিএমের। এ রাজ্যে সিন্ডিকেটের রাজত্ব, তোলাবাজির রাজত্ব, ছিনতাইয়ের রাজত্ব তো সিপিএমেরই আমদানি। সেই পথেই তৃণমূল চলছে। আজকাল এদের বাদ দিয়ে ভোট চলে? ভোট মানেই কোটি কোটি টাকার খেলা। এরা মানুষের মনুষ্যত্বকে মেরে দিয়েছে। মানুষের লোভ লালসাকে জাগিয়েছে, মর্যাদাবোধ নষ্ট করে দিয়েছে। মানুষ ভাবে কিছুই যখন পাচ্ছি না, দু-পাঁচ-দশ হাজার টাকা তো পাচ্ছি। যুবকরাও ভাবে মদ-মাংস খাওয়ার টাকা তো পাচ্ছি। যে দল বেশি টাকা দেবে সে দলের ঝান্ডা নেব। এই হচ্ছে আজকের দিনের রাজনীতি। যারা টাকা নিয়ে ভোট দেয়, তারা কি ভেবে দেখে, এভাবে নিজেরা নিজেদের বিবেক-মনুষ্যত্ব বিক্রি করছে না? আর যে দল বা নেতা টাকা দেয়, তারা কেন দেয়, কোত্থেকে দেয়? তারা যদি সত্যিই ভাল কাজ করত, পাবলিক তো নিজের থেকেই ভোট দিত, মানুষের সমর্থন পাবে না বলেই তো ভোট কেনা হচ্ছে। আর এই টাকা যোগায় কারা? শিল্পপতিরা, বড় বড় ব্যবসায়ী, কালোবাজারি, কন্ট্রাক্টর-প্রমোটারস এই দলগুলিকে গদিতে বসিয়ে ট্যাক্স বাড়িয়ে, জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে, নানা ভাবে আরও লুঠবে বলে। সারা বছর পাবলিককে সর্বস্বান্ত করে প্রায় ভিখারি বানিয়ে ভোটের আগে এ ভাবে ভিক্ষা দেয়। স্বদেশি আন্দোলনের রাজনীতি ছিল আত্মদানের রাজনীতি — জেলে যাব, চাকরি করব না, পরিবার দেখব না, ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দেব। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। এই ছিল সেদিনের রাজনীতি। আর এখন এইসব রাজনৈতিক দলের নেতাদের একমাত্র নীতি হচ্ছে, পুঁজিপতিদের সেবা করব, আর এমএলএ-এমপি হব, মন্ত্রী হব, কোটি কোটি টাকা কামাব। তার জন্য পুঁজিপতিদের থেকে কোটি কোটি টাকা নিয়ে ভোটে নামব, ভোটারদের কিনব, যুবকদের কিনব। এইভাবে যুবকদের পাব যেহেতু এই যুবকদের মধ্যে বিবেক-মর্যাদাবোধ-চিন্তাভাবনা সবই নষ্ট করে দিতে পেরেছি। সেইজন্য যুবকদের আমরা কিনতে পারব। এইভাবে এখন এসেছে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি। একদিকে যেমন

পুঁজিপতি-ব্যবসাদার-মজুতদার-কালোবাজারিরা কোটি কোটি টাকা লুঠছে, তেমনি পুঁজিবাদের সেবাদাস এই ভোটসর্বস্ব দলগুলির নেতারা এমএলএ-এমপি-মন্ত্রী হয়ে কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছে। আপনারা জানেন, পার্লামেন্টের ৮০ শতাংশ সদস্যই কোটি কোটি টাকার মালিক। এরাই কোটি কোটি রিক্ত, নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতিনিধি! মন্ত্রী ও এমএলএ-রা একইভাবে রোজগার করছে। এদের রাজনীতি হচ্ছে বিনা ইনভেস্টমেন্টে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা। এ অবস্থাতেও প্রস্তাব এসেছে মাসিক ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা বেতন-ভাতায় এম-পি-দের সংসার চলছে না, এতই দূরবস্থা, ফলে বেতন দ্বিগুণ করতে হবে। এরাই হচ্ছে আজকের দেশসেবক, জনগণের সেবক!

গত শতকের পাঁচের দশকে ছয়ের দশকে বামপন্থী রাজনীতির মধ্যেও দেওয়ার রাজনীতির প্রভাব ছিল। তখন সিপিএম ছিল না, ছিল ঐক্যবদ্ধ সিপিআই। যদিও তারা কোনও দিনই যথার্থ মার্কসবাদী ছিল না, কিন্তু তাদের মধ্যে সংগ্রামী বামপন্থা ছিল। তাদের নেতাদের মধ্যেও জেলে যাওয়া, মার খাওয়া, কর্মীদের মধ্যে জেলে যাওয়া, মার খাওয়া— এগুলো ছিল। মার্কসবাদী না হলেও ছয়ের দশক পর্যন্ত এগুলো তাদের ছিল। '৬৪ সালের সিপিএমের মধ্যেও এই মানসিকতা ছিল। কিন্তু সিপিএম চৌত্রিশ বছরের রাজত্বে সবচেয়ে বড় সর্বনাশ করেছে— একদিকে বামপন্থাকে কলঙ্কিত করেছে, বামপন্থার মর্যাদাকে নষ্ট করেছে, অন্যদিকে পুঁজিবাদ যা চেয়েছে সেটাই করেছে, গণআন্দোলনকে ধ্বংস করেছে। চটকলের শ্রমিকদের উপর গুলি চালিয়েছে, বন্দরের শ্রমিকদের উপর গুলি চালিয়েছে, নদীয়ার কৃষকদের উপর গুলি চালিয়েছে। নন্দীগ্রামে গুলি চালিয়েছে, মহিলাদের ধর্ষণ করিয়েছে— এ সব ঘটনা আপনারা জানেন। এ সবের দ্বারা পুঁজিপতিদের সন্তুষ্ট করে বারবার ক্ষমতায় এসেছে তারা।

পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি এনেছে সিপিএম

পুঁজিবাদ যা চেয়েছে— মনুষ্যত্বকে, নীতি-নৈতিকতাকে ধ্বংস করা, সেটাও সিপিএম করেছে। আর একটা হচ্ছে, আমাদের দলে এসো, এলে লাইসেন্স পাবে, পারমিট পাবে, কন্ট্রাকটরি হবে, চাকরি পাবে, প্রমোশন হবে, যোগ্যতা না থাকলেও অধ্যাপক হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হবে, পুলিশ অফিসারদের প্রমোশন হবে, ভালো জায়গায় ট্রান্সফার হবে— এই সব জিনিস শিখিয়েছে। ছাত্রযুবকদেরও শিখিয়েছে— আমাদের দলের হয়ে খাটো, টাকা

পাবে, চাকরি পাবে, কন্ট্রাক্টরের অধীনে কাজ পাবে। এই পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি এ রাজ্যে এনেছে সিপিএম। যে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিই এখন চালাচ্ছে তৃণমূল। পরিবর্তনের নামে তৃণমূল শাসন হচ্ছে সিপিএমের কার্বন কপি। সিপিএম যা করত, ওরাও তা-ই করছে। সিপিএম আগে গুছিয়ে করত, আরও সুক্ষ্মভাবে করত, আরও সংগঠিত ভাবে করত, তৃণমূলের ততটা গুছিয়ে সংগঠিত ভাবে করার বুদ্ধি নেই, অনেক সময় ধরা পড়ে যায়— এই পর্যন্ত। তাই তৃণমূল নেত্রী যখন বলেন, সিন্ডিকেট চলতে দেব না, যারা সিন্ডিকেট চালায় তারা মুচকি মুচকি হাসে আর বলে, নেতাদের এসব বলতে হয়। আমরা আমাদের কাজ করব, নেতারা তাদের কাজ করবে। সেদিন কাগজে দেখলাম, মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ অফিসারদের বলেছেন, 'আমি অন্যায় করলেও আমাকে রেহাই দেবেন না। আমাকেও দরকার হলে শাস্তি দেবেন'। এসব বললে, পুলিশ অফিসাররা কী করবে, মুখের সামনে চুপ করে থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যাবে। এরপর তো নিশ্চয়ই এ রাজ্যে দেখবেন চুরি ডাকাতি ছিনতাই তোলাবাজি ধর্ষণ বলে কিচ্ছু থাকবে না। কারণ, মুখ্যমন্ত্রীই বলেছেন, তিনি অন্যায় করলে তাঁকেও শাস্তি দিতে। ফলে ক্রিমিন্যালরা কি আর সাহস পাবে! বাস্তবে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকলেই এইসব ভণ্ডামি, প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ ক্রিমিনালদের চেনা যায়, এদের চেনা মুস্কিল। একসময় বলা হত— ক্রিমিনালাইজেশন অফ পলিটিক্স। মানে ক্রিমিনালরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আসছে। আমরা বলি, পলিটিক্যাল লিডার্সরাই যুবকদের ক্রিমিন্যালাইজ করছে। এই গদিলোভী রাজনৈতিক নেতারাই যুব সম্প্রদায়কে ক্রিমিনালাইজ করছে। এরা সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল। কিন্তু এরা দেশসেবকের আলখাল্লা পরে ঘুরে বেড়ায়। মানুষকে ঠকায়।

সিপিএম নেতা-কর্মীরা ভেবে দেখুন

সিপিএম নেতাদেরও বলি, আপনারা আমাদের কথা শোনেননি, আপনারা চৌত্রিশ বছর রাজ্য শাসন করেছেন, চৌত্রিশ বছর যদি যথার্থ বামপন্থার পথে চলতেন, মহান লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী কমরেড শিবদাস ঘোষ যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, শ্রেণি সংগ্রামকে আরও তীব্রতর করা, গণআন্দোলনকে তীব্রতর করা, মানুষের বামপন্থী চেতনা জাগানো, মনুষ্যত্ব জাগানো— এগুলি যদি করতেন, দলবাজি যদি না করতেন, পুলিশের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে সমাজবিরোধীদের কন্ট্রোল করা, জবরদস্তি সন্ত্রাস— এইসব যদি না করতেন এবং দুর্নীতির যদি প্রশ্রয় না দিতেন, তা হলে কি আজ

আপনাদের দলের এই দুর্দশা হত? আপনাদের তো তিন লক্ষ না চার লক্ষ পার্টি মেম্বার ছিল। ছাত্র ও যুব সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন এগুলি ধরলে কয়েক কোটি আপনাদের লোক ছিল। কিন্তু, যে মুহূর্তে সরকারি ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে গেল, কর্পূরের মতো সব উড়ে গেল। কোথায় চলে গেল, কেন চলে গেল, ভেবে দেখেছেন কি? কারণ সব ছিল সরকারি ক্ষমতাকে ভিত্তি করে, কোনও আদর্শকে ভিত্তি করে নয়। আপনাদের সরকার তো ছিল মধুভাণ্ড। মার্কসবাদ তো দূরের কথা, বামপন্থারও চর্চা করেননি। মধুর লোভ দেখিয়ে সব ভিড় করিয়েছেন। এক সময় আপনাদের দলও লড়ত, আমি বলছি চৌষট্টি পঁয়ষট্টি সালে সাতষট্টি উনসত্তর বাহাত্তর সালেও সিপিএম কর্মীদের যে সাহস, তেজ ছিল আজ তা কোথায় চলে গেল! আজ আপনাদের কংগ্রেসের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে। যে কংগ্রেস ভারতের অন্যতম প্রধান বুর্জোয়া দল, দীর্ঘদিন পুঁজিবাদকে শক্তিশালী করেছে, যে কংগ্রেস কত রক্ত ঝরিয়েছে, '৫২ সাল থেকে '৬৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায়! আপনারা সে সব ভুলে যেতে পারেন, আমরা ভুলিনি। ৩১ আগস্ট যে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করছেন, এই শহিদেরা কার গুলিতে মারা গিয়েছেন সেটা কি ভুলে গেছেন?সেই কংগ্রেসকে আপনারা 'গণতান্ত্রিক' বানাচ্ছেন! যে কংগ্রেস মিসা, টাডা, এসমা, নাসা, আফসপা-র মতো স্বৈরাচারী আইন জারি করেছে, যে কংগ্রেস জরুরি অবস্থা জারি করেছে, সেই কংগ্রেসকে আপনারা 'গণতান্ত্রিক' বানিয়েছেন।

কংগ্রেস কোনও দিনই ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি নয়

কংগ্রেস কি কোনও দিন সেক্যুলার ছিল? চিন্তায় যথার্থ সেক্যুলার ছিলেন বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, ভগৎ সিং। রাজনীতিতে সেক্যুলার হিসাবে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন ধর্মকে রাজনীতি থেকে বাদ দাও, রাজনীতির সাথে ধর্মের সম্পর্ক থাকবে না, রাজনীতি চলবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক নীতির দ্বারা। কংগ্রেস তা করেছে? সেই সময় কংগ্রেস বলেছে, সর্বধর্ম সমন্বয়। সেটা সেক্যুলারিজম নয়। তা-ও বাস্তবে ছিল উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের কর্তৃত্বাধীন কংগ্রেস, যার ফলে শুধু সাধারণ মুসলিমরাই নয়, দলিতরাও স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ আসেনি। যে জন্য দেশও ভাগ হল। কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রে কম দাঙ্গা হয়েছে? ভাগলপুরে, রাউরকেল্লায়, গুজরাটের আমেদাবাদে, আসামের নেলিতে, সর্বশেষ দিল্লিতে শিখদের হত্যা করা হল সরাসরি কংগ্রেস নেতাদের পরিচালনায়। সেই কংগ্রেসকে সিপিএম বানাচ্ছে 'সাম্প্রদায়িকতা

বিরোধী' ও 'সেক্যুলার'। কারণ ভোটের জন্য তাদের কংগ্রেসকে চাই।

আপনারা জানেন, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে ভিত্তি করে আমাদের সাথে তৃণমূলের ঐক্য গড়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনের পক্ষে কারা, আর কারা বিপক্ষে— এই প্রশ্নকে নিয়েই ২০০৯ সালের লোকসভা ও ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আমরা একত্রে লড়েছি, কিন্তু কখনও তৃণমূলের গায়ে 'গণতান্ত্রিক', 'সেক্যুলার' তকমা আমরা লাগাইনি। এবারও ওদের কোনও কোনও নেতা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ওদের সাথে গেলে হয়ত জয়নগর, কুলতলি জিততে পারতাম, একই ইঙ্গিত সিপিএমও দিয়েছিল জয়নগর আমাদের ছেড়ে দেবে বলে। আমরা সিটের লোভে এই নীতিহীন ঐক্যে যাইনি। আমরা ভোটে হেরেছি মানি পাওয়ার, মিডিয়া পাওয়ার, মাসল পাওয়ারের কাছে। কিন্তু আমরা কি তাতে দুর্বল হয়ে গেছি? আমাদের শক্তি বেড়েছে বৈপ্লবিক আদর্শের জোরে। শক্তি যে বেড়েছে আজকের এই বিশাল জমায়েত তার প্রমাণ। প্রবল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আপনারা হাজারে হাজারে এতক্ষণ ধরে বক্তব্য শুনছেন, শিশু কোলে নিয়ে মায়েরাও শুনছেন। অন্য কোনও দল লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেও কি এই চরিত্রের জমায়েত করতে পারে?

গদিসর্বস্ব রাজনীতির জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে সোসাল ডেমোক্র্যাটিক সিপিএম

সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি হিসাবে যতক্ষণ সিপিএমের বুর্জোয়া রাষ্ট্র কাঠামোয় সরকারে যাওয়ার সুযোগ ছিল না, ততক্ষণ তাদের সংগ্রামী বামপন্থার চরিত্র ছিল, কিন্তু সরকারে যাওয়ার পর থেকে ক্রমাগত ভোট ও গদিসর্বস্ব রাজনীতির জালে জড়িয়ে পূর্বেকার সংগ্রামী বামপন্থী চরিত্র হ্রাস পেতে থাকে এবং বিগত ৩৪ বছরের শাসনের মাঝামাঝি থেকে এটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। অনেকটা ব্রিটিশ লেবার পার্টি ও ইউরোপের সোস্যালিস্ট দলগুলির যে হাল হয়েছে সিপিএমেরও আজ সেই দশা।

আমরা মনে করি, আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী, সিপিএম নেতৃত্ব যদি লেনিনীয় শিক্ষা অনুযায়ী প্রকাশ্যে অকপটে নিজেদের ভুল-অন্যায় স্বীকার করতেন এবং যথার্থ সংশোধনের পথে যেতেন, সংগ্রামী বামপন্থী রাস্তা গ্রহণ করতেন, তা হলে জনগণের মধ্যে এবার ভোটে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা অনেকটা বাড়ত। যারা গত ৫ বছরের তৃণমূল শাসনে অসন্তুষ্ট সেই জনগণও এবার চায়নি সিপিএম আবার ক্ষমতায় আসুক। ৩৪ বছরের সিপিএম শাসনের আতঙ্ক এখনও তারা ভুলতে পারেনি। এটা তৃণমূলকে সাহায্য করেছে। তা

সত্ত্বেও আগামী ৫-১০ বছর বাদে স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল জনপ্রিয়তা হারাবে, তখন হয়ত বুর্জোয়াশ্রেণি বিকল্প হিসাবে সিপিএম-কংগ্রেস জোটকে বা সিপিএমকে ক্ষমতায় বসাবে। কিন্তু তাতে সিপিএমের যতটুকু বামপন্থী বৈশিষ্ট্য আজও আছে, সেটা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

জনগণের সামনে অকপটে ভুল স্বীকারই লেনিনীয় শিক্ষা

আমরা এখনও সিপিএম নেতা-কর্মীদের ভেবে দেখতে বলি, আপনারা ভুল স্বীকার করুন। বলুন আমরা ৩৪ বছরে যা করেছি সেটা বামপন্থার পথে হয়নি, আমরা অন্যায় করেছি। জনগণের কাছে ক্ষমা চান আপনারা। মহান লেনিন বলেছিলেন, কমিউনিস্টরা ভুল করলে প্রকাশ্যে ভুল স্বীকার করে। শুধু ভুল স্বীকার করে তা নয়, সে বিচার করে বলে কেন ভুল হল? কারণ কী এবং কীভাবে সংশোধন করবে তা-ও জনগণকে বলে। লেনিনের এই শিক্ষার কথা সিপিএম নেতাদের বলেছিলাম। যথার্থ মার্কসবাদী দল হলে সিপিএম লেনিনের এই শিক্ষা অনুসরণ করত। আজও সিপিএমের মধ্যে বামপন্থী মনোভাবসম্পন্ন বেশ কিছু নেতা কর্মী আছেন। তাঁদের কাছে আমাদের আবেদন নেতারা আপনাদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে, গদির লোভে একটা বুর্জোয়া দলকে শক্তিশালী করছে, পরিণামে আপনাদের দল দুর্বল হচ্ছে। আপনারা এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ান। আপনারা আবার সংগ্রামী বামপন্থার রাস্তায় ফিরে আসুন। সিপিএমেএর পার্টি কংগ্রেসে দাঁড়িয়ে এই কথাই আমরা দলের তরফ থেকে বলেছিলাম। আপনারা আসুন আমরা একত্রে দাঁড়াই, লড়াই করি।

বিজেপি-আরএসএস স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে

কমরেডস ও বন্ধুগণ, এই বৃষ্টির মধ্যে অনেক কষ্ট করে আপনারা শুনছেন, আমি আর সময় নেব না। আরও অনেক কিছু বলার ছিল। শুধু এটুকু বলব, দেশে এখন ধর্মীয় মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে। আরএসএস-বিজেপি হিন্দু ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতায় উস্কানি দিচ্ছে, পাল্টা মুসলিমদের মধ্যেও একই জিনিস চলছে। এটা একদিকে করা হচ্ছে, পুঁজিবাদকে রক্ষা করার স্বার্থে ধর্মীয় গোঁড়ামি বাড়াতে, যাতে মানুষকে বোঝানো যায়, 'তুমি বেকার কেন, অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় মরছ কেন— কারণ এটা তোমার পূর্ব জন্মের পাপের কর্মফল, ধনী-গরিব ভগবানের সৃষ্টি, সবই খোদা কা মর্জি নসিব কা খেল।' এ সব বোঝালে মানুষ আর

প্রতিবাদ করবে না, লড়াই করবে না। এভাবে যুক্তিবাদী মন, গণতান্ত্রিক মানসিকতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ধ্বংস করা হচ্ছে। অন্য দিকে হিন্দু-মুসলিম, উচ্চবর্ণ-দলিত, নানা প্রাদেশিকতার আগুন জ্বালিয়ে জনগণের ঐক্য, গণ আন্দোলনের ঐক্য বিনষ্ট করা হচ্ছে, তা ছাড়া হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক, মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক, উচ্চবর্ণ ও দলিত ভোট ব্যাঙ্ক এসবও করা হচ্ছে পুঁজিবাদের সেবাদাস দলগুলির স্বার্থে। স্বদেশি আন্দোলনের নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তার দ্বারা যতটুকু জনগণের ঐক্য গড়ে উঠেছিল, এরা তাকে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে।

বিজেপি নেতারা 'দেশপ্রেমের' ধ্বনি তুলছেন। তাদের প্রশ্ন করুন, বিজেপি'র জনক আর এস এস নেতারা স্বদেশি আন্দোলনে কী করেছেন? যখন এই দেশের শত শত ছেলেমেয়ে জেলে যাচ্ছে, পুলিশের মার খাচ্ছে, প্রাণ দিচ্ছে, তখন আর এস এস স্বদেশি আন্দোলনে ছিল না। কেন জানেন? ওদের গুরু গোলওয়ালকর বলেছেন, আমি তার বক্তব্য বই থেকে পড়ে শোনাচ্ছি— "ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ও সাধারণ বিপদের (কমন ডেঞ্জার) তত্ত্বকে ভিত্তি করে আমাদের যে জাতিতত্ত্ব গঠিত হয়েছে সেটা কার্যত হিন্দু জাতিতত্ত্বের সদর্থক প্রেরণা থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে এবং আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কার্যত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত করেছে। ব্রিটিশবিরোধিতার সাথে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদকে সমার্থক করা হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলন, তার নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষের উপর সর্বনাশা প্রভাব ফেলেছে।"[১২] তিনি আরও বলেছেন যারা হিন্দু জাতীয়তাবাদের কথা বলছেন না, তাঁরা হচ্ছেন, "হয় জাতীয় স্বার্থের শত্রু বা বিশ্বাসঘাতক অথবা সাধারণভাবে বলতে গেলে ইডিয়ট।"[১৩] আর এস এস-এর গুরুর এই বক্তব্য অনুযায়ী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, লালা লাজপত, তিলক এবং নেতাজি, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরামদের কী বিশেষণে আখ্যায়িত করতে হয়? আপনারাই বিচার করে দেখুন। কারণ এঁরা তো কেউই হিন্দু জাতীয়তাবাদের জন্য লড়েননি। এখন এই বিজেপি-আর এস এস নেতারাই 'দেশপ্রেমের বন্যা' বইয়ে দিচ্ছে। তাদের ভাগ্য ভাল, আজকাল অনেকেই এসব ইতিহাস জানে না। আমরা আগেই বলেছি, ওরা যদি হিন্দু ধর্মের যথার্থ সেবক হন, তাহলে চৈতন্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ এঁরা কেউই হিন্দু ছিলেন না। কারণ এঁরা রামচন্দ্রের জন্মস্থান আবিষ্কার করতে যাননি, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ডাক দেননি। রামকৃষ্ণ নিজে মসজিদে নামাজ পড়েছেন, গির্জায় প্রার্থনা করেছেন। বলেছেন ভগবান, আল্লা, গড একই। বিবেকানন্দ বলেছেন সব ধর্মকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করতে। তিনি এমনও বলেছেন, "আমার যদি একটি

সন্তান থাকত, তাকে মনোসংযোগের অভ্যাস এবং সেই সঙ্গে এক পংক্তির প্রার্থনা ছাড়া কোনও প্রকার ধর্মের কথা শিখতে দিতাম না। তারপর সে বড় হয়ে খৃষ্ট, বুদ্ধ বা মহম্মদ যাঁকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে। ...সুতরাং, এটা খুবই স্বাভাবিক যে একইসঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং নির্বিরোধে আমার ছেলে বৌদ্ধ, আমার স্ত্রী খৃষ্টান এবং আমি মুসলমান হতে পারি।"[১৪] তাঁর এ রকম বহু কথা বই খুলে দেখাতে পারি। তাই বলছি এরা ধর্মের নামে অধর্ম করে বেড়াচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে আগে নেতাজির প্রভাব, বামপন্থী আন্দোলনের প্রভাবের ফলে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মতো শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও হিন্দু মহাসভা জায়গা করতে পারেনি। আজ সিপিএমের দ্বারা বামপন্থা দুর্বল ও কলঙ্কিত হওয়ায় বিজেপি-আরএসএস শক্তি বাড়াচ্ছে। এটা উদ্বেগের কথা। অন্য দিকে বিজেপির যতটা শক্তি বেড়েছে, তার থেকেও বেশি করে দেখাচ্ছে একদিকে তৃণমূল ও অন্যদিকে সিপিএম নিজ নিজ স্বার্থে। তৃণমূল 'মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক' গড়া ও রক্ষার জন্য বিজেপির শক্তি বাড়িয়ে দেখাচ্ছে, আর সিপিএম কংগ্রেসের সাথে জোট করাকে 'যুক্তিসঙ্গত' প্রমাণ করতে দেখাচ্ছে এই জোট না হলে বিজেপি দ্বিতীয় স্থান দখল করত। এভাবে উভয়েই বিজেপির প্রচার বাড়িয়ে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধিতেই সাহায্য করছে।

ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদীরা ধর্মের শিক্ষার বিরুদ্ধেই কাজ করছে

ইসলাম ধর্মের নামে যে জঙ্গিবাদ চলছে তা হজরত মহম্মদের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী। হজরত মহম্মদ তাঁর পূর্ববর্তী তিন জন ধর্ম প্রচারক ইব্রাহিম, ইসা, মুসা— এঁদের প্রচারিত ধর্মের বিরোধিতা করেও এঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেছিলেন, ওঁরাও আল্লার প্রেরিত পয়গম্বর, ওঁদেরও আমার মতোই সম্মান করবে। হজরত মহম্মদ নিজে আক্রান্ত হয়ে তিনবার যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু নিজে কাউকে আক্রমণ করেননি। কোনও বন্দিকে হত্যা করেননি এবং হত্যা করতেও দেননি। মদিনায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন, পৌত্তলিকতাবাদী, ইহুদি ও মুসলিমরা সকলেই নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মপালন করবে, কেউ কাউকে বাধা দেবে না। এমনকী তিনি মক্কায় যখন প্রবেশ করেন, তাঁর প্রধান শত্রু, যে তাঁকে বারবার আক্রমণ করেছে সেই আবু সুফিয়ানকে বন্দি করে যখন আনা হল, তখন অন্যরা চাইছিল তাকে হত্যা করতে, কিন্তু হজরত মহম্মদ তাকে স্বধর্মে দীক্ষিত করে নিলেন। এই হচ্ছে ইসলাম ধর্ম। ইসলাম কথার অর্থই হচ্ছে শান্তি। হিন্দু ধর্মপ্রচারকদের কথা আগেই বলেছি। ফলে যারা হিন্দু ধর্মের নামে মুসলিম ও দলিতদের উপর

অত্যাচার চালাচ্ছে, তারা হিন্দু ধর্মের বিরোধী। যারা ইসলাম ধর্মের নামে অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে, তারাও ইসলাম ধর্মের বিরোধী।

আজ যে বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় মৌলবাদ, ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ, নৈতিকতার সংকট এত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে তার কারণ কী? এর প্রথম কারণ হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উপনীত হয়ে পশ্চিমের পুঁজিবাদী সভ্যতা যখন প্রায় অস্তমিত হয়ে মানব জাতির সামনে দুর্যোগের অন্ধকার নিয়ে এল, তখন মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে হাতিয়ার করে মহান লেনিনের নেতৃত্বে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে রাশিয়ায় যে সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা কায়েম হয়েছিল এবং যে ব্যবস্থাকে পশ্চিমি দুনিয়ায় মানবতাবাদের শেষ প্রতিনিধি রমা রল্যাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইন, আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নেতাজি, ভগৎ সিং, প্রেমচন্দ, সুব্রহ্মণিয়ম ভারতী ও নজরুলরা নতুন সভ্যতার সূর্যোদয় হিসাবে অভিনন্দিত করেছিলেন, যে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের কর্ণধার মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী শক্তি পরাস্ত হয়েছিল এবং পূর্ব ইউরোপে, চীনে, ভিয়েতনামে সমাজতন্ত্র বিস্তার লাভ করেছিল, দেশে দেশে শক্তিশালী বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন, উপনিবেশ-আধা-উপনিবেশগুলিতে প্রবল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল—এসবকে ভিত্তি করেই পুনরায় উন্নত নৈতিকতায় বিশ্বের মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। গভীর বেদনার বিষয়, সেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাইরের সাম্রাজ্যবাদ ও ভিতরের পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্রে ধ্বংস হয়েছে। যার ফলে পুনরায় বিশ্বব্যাপী প্রবল অন্ধকার মানবজাতিকে বিপন্ন করছে। সমাজতন্ত্র ধ্বংস হলে এরকমই যে ঘটবে, এই আশঙ্কা একদিন মনীষী রমাঁ রল্যাঁ ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আজ পৃথিবীতে সোভিয়েত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমাবেশ গড়িয়া উঠিতেছে। ...যদি ইহা ধ্বংস হইয়া যায় তবে শুধু পৃথিবীর সর্বহারারাই ক্রীতদাসে পরিণত হইবে না, সামাজিক বা ব্যক্তিগত সর্বপ্রকারের স্বাধীনতারই সমাধি ঘটিবে। বিশ্বকে বহু যুগ পিছনে ফেলিয়া দেবে। ... কয়েক শতাব্দীর মতো সেখানে অন্ধকার গভীর হইয়া নামিয়া আসিবে।"[১৫] বাস্তবে এই সংকটের সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে উস্কানি দিচ্ছে যাতে দেশে দেশে আর গণআন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন মাথা তুলতে না পারে। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ জানে সংকটগ্রস্ত জনগণ বারবার বিক্ষোভে ফেটে পড়বে, কিন্তু বিপ্লবী আদর্শ, উন্নত নৈতিকতা ও সঠিক নেতৃত্ব না থাকলে পুঁজিবাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে না। বিক্ষোভ বিপ্লবে রূপান্তরিত হবে না। আজ ঘটছেও তাই। বিশ্ব

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েই ওরা ইরাক, আফগানিস্থান, লিবিয়াকে ধ্বংস করেছে, সিরিয়াতে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে, সিয়া-সুন্নি সংঘর্ষ বাধিয়েছে। মনে রাখবেন, আল কায়েদা হতে শুরু করে আইএস সবই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি, ওদের অর্থ ও অস্ত্রেরও জোগান দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীরাই নিজেদের অস্ত্রশিল্পকে চাঙ্গা রাখার জন্য।

ফলে এই অবস্থায় বেকারত্ব, ছাঁটাই, মূল্যবৃদ্ধি, অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু, মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার সঙ্কট, ধর্মীয় মৌলবাদ ইত্যাদির হাত থেকে মানব সভ্যতাকে বাঁচাতে হলে পুনরায় চাই দেশে দেশে মার্কসবাদকে হাতিয়ার করে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলন। আগামী বছর ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লবের শতবার্ষিকী উদযাপিত হতে চলেছে। এই উপলক্ষে আমাদের পুনরায় শপথ নিতে হবে, দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সংগঠিত ও জয়যুক্ত করার।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই আনতে পারে যথার্থ মুক্তি

বিশ্বের কোটি কোটি শোষিত নির্যাতিত মানুষ আর্তনাদ করছে মুক্তির জন্য। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই আনতে পারে যথার্থ মুক্তি। এর জন্য চাই যথার্থ মার্কসবাদী বিপ্লবী দল, বিপ্লবী রাজনীতি, বিপ্লবী সংস্কৃতি, বিপ্লবী চরিত্র— কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি যথার্থ বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল এ দেশে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজ এই ৫ আগস্ট এই দলকে আরও শক্তিশালী করার প্রতিজ্ঞা আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

আজ আমাদের দেশে চাই পুনরায় ভগৎ সিং-এর মতো চরিত্র। যে ভগৎ সিংকে তাঁর বন্ধুরা ফাঁসির পূর্বে প্রস্তাব দিয়েছিল, তুমি চাইলে তোমাকে জেল থেকে বের করে আনতে পারি। ভগৎ সিং উত্তর দিলেন, আমি আজ বিপ্লবের প্রতীক, আমি যদি পালিয়ে যাই বিপ্লবের প্রতীক কালিমালিপ্ত হবে। আমি হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দেব যাতে ভারতবর্ষে মায়েরা চাইবে তাঁদের কোলেও ভগৎ সিং জন্ম নিক। এর ফলে দেশে অসংখ্য বিপ্লবী যোদ্ধা জন্ম নেবে। নজরুল বাংলার মায়েদের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন— ক্ষুদিরামের মা হও। আমাদের চাই অসংখ্য এই ধরনের বিপ্লবী, অসংখ্য ক্ষুদিরাম, অসংখ্য ভগৎ সিং, অসংখ্য প্রীতিলতা। যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার পতাকা বহন করবে এবং পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়বে।

সর্বশেষ আপনাদের কাছে আবেদন করব, পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে সব বড় মানুষদের জীবন ও সংগ্রামের চর্চা করুন। বিপ্লবী শহিদদের জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে চর্চা করুন। আপনাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের সেই ভাবে তৈরি করুন। দেখুন, পাড়ায় পাড়ায় বাচ্চারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, নোংরা স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। আমাদের দলের কর্মীদেরও বলেছি, জনগণকেও বলছি, আপনারা প্রত্যেকে সপ্তাহে একটি দিন আপনাদের পাড়ার বাচ্চাদের ডাকুন, তাদের নিয়ে খেলাধূলা করান, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা করান এবং বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে সুভাষ বোস রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র এবং বিপ্লবীদের জীবন কাহিনীর চর্চা করিয়ে এদের সত্যিকারের মানুষ হিসাবে তৈরি করুন। মনুষ্যত্ব সৃষ্টির একটা আন্দোলন শুরু করুন। এ না হলে আগামী দিন আরও ভয়ঙ্কর হবে। ফলে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী রাজনীতি ও সংস্কৃতি চাই, আর সেই রাজনীতি-সংস্কৃতির চর্চা করছে একমাত্র আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে। এই দলকে আপনারা সর্বাত্মক সাহায্য দিয়ে শক্তিশালী করুন। সর্বহারা বিপ্লবী রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে বলীয়ান হয়ে শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে তুলুন, গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলুন। এই কথা বলে আজ আমি এখানেই শেষ করছি।

পরিশিষ্ট

১) শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে, শিবদাস ঘোষ রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড
২) বিদ্যাসাগর চরিত — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩) জীবনস্মৃতি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪) বিদ্যাসাগর চরিত — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫) বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র
৬) করুণাসাগর বিদ্যাসাগর —ইন্দ্রমিত্র
৭) ঐ
৮) সভ্যতার সংকট — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৯) ঐকতান — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০) কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১১) শ্রমিকের কাছে সর্বহারা রুচি-সংস্কৃতি তুলে ধরুন — শিবদাস ঘোষ রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড
১২) বাঞ্চ অফ থটস — গোলওয়ালকর
১৩) ঐ
১৪) বাণী ও রচনা, তৃতীয় খন্ড — বিবেকানন্দ
১৫) শিল্পীর নবজন্ম — রমা রঁল্যা